রণজিৎ দাশ

দিঘা সিরিজ

১
সমুদ্রসৈকত জুড়ে সারিবদ্ধ লাউড স্পিকারে
নিস্তব্ধ সকালবেলা কেন বাজে রবীন্দ্রসঙ্গীত—
সৈকতের ধ্যানমূর্তি খান খান করে?

কেন বাজে এই গান,
'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'?

এ কি তবে সমুদ্র ও সঙ্গীতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার
কোনও নিসর্গ আসর?

জনশূন্য বালুতটে আমি কি তাহলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার
আতঙ্কিত, মূর্খ বিচারক?

বিশাল সমুদ্রতীরে, এ কী অগ্নিপরীক্ষা আমার?

নৈঃশব্দ্য-পূজারি আমি, তবু যেন দেখি—
চরাচরব্যাপী এই মানুষের পুণ্যাকাঙ্ক্ষী গানে
সমুদ্রেরও ব্যথা জ্বলে ওঠে ঊর্ধ্ব-পানে...

২
যে-কেউ সমুদ্রে এসে দেখে যেতে পারে
দ্বিপ্রহরে, অবলুপ্ত দিগন্তরেখায়—
আকাশ ও সমুদ্র একই, মহাপৃথিবীর
অবিচ্ছেদ্য, শান্ত নীলিমায়

৩
যক্ষা রোগীর মতো শীর্ণকায় ঝাউবনে
বিষণ্ণ কাকের ডাক, ঘেয়ো কিছু কুকুরের খেলা
প্রতিবারই এসে দেখি, হাড়সাদা বালির টিলায়—

আমার অপরিহার্য নিয়তির মতো,
ক্ষমাহীন, শান্ত ভোরবেলা

৪
এই ঝাউবনে হয় বাংলা সিনেমার
নায়ক-নায়িকাদের মিলনার্ত আলিঙ্গন ও গানের শুটিং
সিক্তবসনা নারী অনিঃশেষ ভেঙে পড়ে নায়কের বুকে—
যেন মনে হয়, এই পৃথিবীর ঝাউবন
অন্তহীন আলিঙ্গনে ভরা!

তার পরেই প্যাক-আপ, হোটেলে হুইস্কি, সোডা,
কলহ, ব্রেক-আপ,
তারও পরে বেশি রাতে রুমে রুমে অফুরন্ত পাপ...

এই ঝাউবনে সেই মিথ্যা সিনেমার ছবি
নাচ, গান, তীব্র চুমু, প্রেমের উল্লাস
আমার নিয়তিদৃশ্যে রেখে যায় নগ্ন পরিহাস!

৫
সকালের সমুদ্র দেখে মনে হয়, যেন
ক্রুদ্ধ ও বিরূপ পিতৃদেব আমার—
বাবাকে 'আপনি' বলতাম,
সমুদ্রকেও 'আপনি' বলে সম্বোধন করি,
শুনি তাঁর জলশব্দে চাপা তিরস্কার

৬
দিঘার সমুদ্রে আসি বনের পশুর মতো একা—
ঢেউয়ের গর্জনে শুনি পাতালের গুম গুম ধ্বনি
রাত্রির সমুদ্রে দেখি অন্ধকার ছায়ামূর্তি আমার জননী
টুলারের আলো জ্বেলে উনুনে রন্ধনরত
আমাদেরই ভাত—
তাঁকে ঘিরে খিদে, ঘুম, নক্ষত্রের রাত!

দিঘার সমুদ্রে আসি বনের পশুর মতো একা—
ঝাউবনে বসে লিখি বিষাদসিন্ধুর কিছু লেখা

ওবায়েদ আকাশ

মেটারমরফসিস: মনিরুজ্জামান

ছিপি খুলে ঘুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মনিরুজ্জামান

কারা যেন দীর্ঘ ঘুম মুড়ি দিয়ে পড়েছিল চিলেকোঠার খাটে
এবং প্রস্থান কালে ঘুমের মুখে ছিপি এঁটে
পেরিয়ে গেছে প্রমোদ সরণি

আমাদের মনিরুজ্জামান তাতে আটকা পড়ে
কতগুলো পুকুরারের চারা এবং অরণ্যের ডিম
সফল প্রজনন হেতু ফেলে এসেছে; এবং পুকুরের গায়ে
জলপাই শ্যাওলার এক প্রকাণ্ড চাদর প্রান্ত ধরে টেনে
শরীরে মুড়িয়ে লোকালয়ে ফিরে এসেছে

আজকাল তার সন্তানের প্রতি সিংহের মতো স্নেহ এবং
স্ত্রীর প্রতি ইঁদুরের মতো নিষ্কণ্টক ভালবাসা দেখে
কেউ কেউ তার নাম পাল্টে ফেরারি রেখেছে

গাঁগঞ্জের ফেরারি-মন মানুষেরা উঠতে-বসতে ঘুরতে-ফিরতে
সারাক্ষণ তাকে বন্দি করে রাখে
এবং ব্যক্তি মানুষেরা তার মতো আকস্মিক বদলে যেতে
কেউ বাঘের মতো কেউ ছারপোকার মতো অভিনয় করে
তার মনোযোগ খুঁজতে থাকে

শুধু মনে মনে ভাবে মনিরুজ্জামান:
এক জীবনে আর কতবার বদলালে
একদিন শীতল বৃষ্টির মতো আকাশের করুণা কুড়নো যাবে!

গগন ঠাকুর: গণিতজ্ঞ

গগন ঠাকুর গণিতজ্ঞ ছিলেন
লিটল ম্যাগাজিনের দুর্মূল্য খাঁচায় তার নাম
যাদুঘরের প্রহরী-বেষ্টিত উজ্জ্বল হয়ে আছে

জীবনে প্রথম তিনি ভাষাবিজ্ঞান থেকে নেমে
লোকসংস্কৃতির দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন রিক্সার চাকা
তারপর নাটক সরণির মুখোশের কেনাবেচায়
গণিত বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন

এবং যে কোনও বাহাস কিংবা প্রথম প্রথম কবিতার খাতায়
ব্যাকরণ থেকে জ-ফলা (্য) কিংবা নৈতিকতা থেকে ঐ-ফলা (ৈ) ছিঁড়ে
বাতাসে উড়িয়ে দিতেন বলে
একদা এ্যান্টি এস্টাব্লিশমেন্টের কয়েকজন তরুণ কর্মী
তাকে গভীর উৎসাহে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়

বলে, যে কোনও স্কুলিংয়ের নির্জনতায় জনসভার উত্তেজনা
কিংবা কফি হাউসের ছায়াতলে সরাইখানার পরাপাঠ
রটিয়ে দিতে পারলেই তবে মুক্তি

কোনওদিন মুক্তি নেননি গগন ঠাকুর
বরং দীর্ঘ কারাবাস কালে তিনি এ্যালজ্যাবরার প্লাসগুলো একদিকে
এবং বন্দিজীবনের নিঃসঙ্গতা ও অপ্রাপ্তিগুলো একদিকে রেখে
প্রতিদিন ঘুমোতে অভ্যস্ত ছিলেন

একদিন যোগের সঙ্গে ভাগ এবং নিঃসঙ্গতা ও অপ্রাপ্তির সঙ্গে
গুণিতকের গভীর সখ্যের দরুন ওরা মধ্যরাতে হাত ধরে পালিয়ে চলে গেল

অথচ তিনি প্লাসের সঙ্গে মরালিটি এবং
মাইনাস ও একাকিত্বের সঙ্গে হিউম্যানিটির সমন্বয়গুলো
গভীর কাছ থেকে ভেবে এসেছিলেন—

গগন ঠাকুর গণিতজ্ঞ ছিলেন। এ-মতো গাণিতিক সমস্যা
জীবনে এটাই প্রথম বলে তার মীমাংসা হেতু
নতুন কোনও লিটল ম্যাগাজিনের খাঁচার দিকে তাকিয়ে আছেন

নন্দিনী শরীরীকলায়

কলাবিদ্যায় ঝুলে আছে নন্দিনীর কাটা স্তনের পাশে
বাইজানটাইন সভ্যতার ঘুমন্ত ফড়িং

নন্দিনীর শরীরীকলায় ধৃষ্টতার দাঁতগুলো
সাদাকালোয় রাঙিয়ে দিয়েছে ক্ষণিক পৃথিবী
মথ এসে খেয়ে গেছে প্রাতঃকিরণের যত রক্তলালপ্রীতি

নন্দিনী তার শরীর ছেকে টেনে টেনে
লোকালয়ে ছুড়ে দিচ্ছে সভ্যতার ভেজা বস্ত্রগুলি

তা থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসছে কারওবা মাথা
কারও হাত পায়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ, নাভি

নন্দিনীর কাটা মস্তকের ঢালে আজ আবার মেঘ করে
শীত ঋতু ভিজিয়ে দিতে ঝুঁকে এসেছিল বর্ষণের দ্বিধা

হস্তরেখা ফাঁকি দিয়ে গুণী-ঋষি জেনেছিল
কলাবিদ্যা ভেসে যাবে এমন প্লাবন যদি দীর্ঘায়িত হয়

কবন্ধ শরীর ফুঁড়ে আবার নন্দিনী উঠে
অবিকল ডুবে গেছে শরীরীকলায়

পঞ্চানন ঘোষ: ঘোল বিক্রেতা

ভোর হতে না হতেই কুমার নদের কম্পমান সাঁকো পাড়ি দিয়ে
পঞ্চানন ঘোষ ঘোল নিয়ে আসেন— 'ঘোল, হেই ঘোল' বলে—
কিংবা আমিই ছুটে যাই দুরু দুরু বুকে বাঁশের সাঁকো হেঁটে

আমি যখন গ্লাস ভরে ঘোল দিতে বলি, ভেসে ওঠা ছানার দিকে
চোখ চলে যায়, আর পঞ্চানন যখন একবার আমার দিকে একবার
ঘোলের দিকে তাকিয়ে ঘোল দিতে যায়
ঘোলের পাত্রের নিচে অথৈ জলে বন্যা বয়ে যায়...

আমি তাকে বলি, এত জল কোথা থেকে আসে?
পঞ্চানন বলে, ছোট্টবেলায় সাঁতার কাটতাম আরও গভীর জলে

আমি পঞ্চাননের মুখের দিকে বিস্ময়ভরে তাকাতেই
তার চোখের মণিতে দু'চার বছর দু'তিনজন শিশু সন্তানের মুখ
ভেসে উঠতে দেখি। দেখি তারা সাঁতার কাটছে
আরও অথৈ জলে

আমি পঞ্চাননকে বলি, তোমার পাত্র থেকে জল ছেকে
আরেক গ্লাস ঘোল ঢেলে দাও
পঞ্চানন ঘোলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আমার দিকে
জলবিহীন ঘোল তুলে দেয়
আমি কী মজা কী মজা বলে চুকচুক করে ঘোল চেটে খাই আর

পঞ্চাননের চোখ থেকে শিশুগুলো
ঝুরঝুর করে মাটিতে পড়ে যায়

বিভাষা

বিভাষা, বন্ধুর বোন
দু'হাতের কব্জির ঢালে
দাবড়ে বেড়াচ্ছে রেলগাড়ি

চিচিং ফাঁক এক মটর চালকের তলপেট
জানতে চাইছে
বিবিধ বমন পদ্ধতি

স্টেশন পেরুলেই আটলান্টিকের চাবি
ট্রেনের ভেজানো দরজায়
তিন তিনটি মহাদেশের
নেমে যাবার ছাপ—
প্রতিটি ছাপেই স্পষ্ট বন্ধুর বোনের মুখ
দ্রুতযান

একদা মায়া সভ্যতায়
আমরা কতিপয় মিলে
এমনই এক ট্রেনে রুপালি ইঞ্জিন জুড়েছিলাম

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ব্যাধি বিনিময়

ধু-ধু মাঠের ক্ষয়িষ্ণু প্রান্তিকে
তমাল ছায়ায় নবেন্দু আমাকে
খুলে বলল তার নিঃসঙ্গতা
সারবার নয়, সুপর্ণা যদিও
জুগিয়ে চলে ওষুধপত্তর।

বলতে বলতে তার অবক্ষয়
সংক্রমিত করল আমার মনে,
তবুও আমি সব কথা তার শুনি
যদিও আজ অক্ষয় তৃতীয়া,
চিকিৎসকের থেরাপি করা মানা।

বলতে বলতে সেরে উঠল যেই
ভার নিল সে আমায় সারাবার,
বাজিয়ে দিল সেই যে কবেকার
তমাল গাছের কোটরে গচ্ছিত
জয়দেবের আনন্দলহরী।

সব্যসাচী দেব

সাঁকোর পাশে

সাঁকোর ঠিক নীচে জলের মৃদু স্রোতে মেঘের ছায়া দেখে থমকে যাই
মেঘ না জলধারা কারা যে বয়ে যায়। এখনও সাদা কাশ দোলে হাওয়ায়

মনখারাপ করা একলা সাঁকো রেখে রোদের পিছু পিছু বিকেল যায়
যাবে তো একদিন সময় হলে তবু কীসের এত তাড়া, কীসের দায়

যা কিছু বলা হল বলিনি যতটুকু সবটা মিলেমিশে দিনলিপি
দোয়াত মাঝে মাঝে উল্টে পড়ে আর কখনও বেড়ে ওঠে উইটিপি

দেখো এ কড়াপড়া কালচে করতলে দীর্ঘ ভ্রমণের কথামালা
কিছুটা রোদজ্বলা কিছুটা শীতে কাঁপা কিছু-বা বর্ষার জল ঢালা

কোথাও পলাশের রক্ত লেগে নেই পাবে না আবিরের দীর্ঘশ্বাস
তবুও তোমাকেই ডাকছি জেনে এই শূন্য সময়ের জটিল ফাঁস

যদি-বা পাকে পাকে বাঁধতে চায় তবু কোন সে জাদুভরা বাস্তবের
ঠিকানা মিলে যায়, প্রাত্যহিক থেকে জাগতে থাকে মায়াজগৎ ফের

তোমাকে তাই চাই, সন্ধ্যা নেমে আসে, সাঁকোর নীচে জল ছলাৎ ছল
একটু আরও থাকো, একটু হাতে হাত, একটু ঝরে যাক চোখের জল

সন্দীপন চক্রবর্তী

কবিতা

স্মৃতির ভিতর তুমি বেঁচে থাকো রক্তপায়ী শিকড়ের মতো
অন্ধকার জল তুমি, ভেঙে যাও সহস্র ধারায়—
সটান বর্শার মতো বিঁধে যাও বুকে চোখে পেটে
ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো শিরদাঁড়া, তাও যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাও তুমি
প্রলয়ের মাঝে ভাস নোয়ার নৌকার মতো, ঘটনাবিহীন

স্তব্ধতার খনি থেকে গুলমোহরের চারা তুলে আনো তুমি
তুলে আনো কথাবীজ, সময়হীনের ফুল, আলো—
ধরা ও ছোঁয়ার থেকে সরে যাও কোয়ান্টাম লাফে।
আলোকবর্ষ দূরে খিলখিল হাসি তুলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে যাও
শূন্যের ভিতর থেকে খাই মারো বিষাদের মতো

মিথুনসঙ্গীকে তুমি অতর্কিত গিলে নাও সঙ্গমের শেষে।
তোমাকে চিনি না আমি, কিছুটা চিনিও, তুমি ক্যামোফ্লাজে এসে
আমার সর্বস্ব নিয়ে চলে গেছ, সর্বস্ব দিয়েছ

তুমি কি কবিতা শুধু? শুধুই কবিতা?

সুমন জানা

ফুটপাথ

ফুটপাথ আছে বলে কলকাতা আছে
না হলে আমার কাছে কাঁথি বা কলেজ স্ট্রিট একই।
ফুটপাথ আছে বলে খোসা ভেঙে ভেঙে
বাদাম খাওয়ার মতো বিটনুন সহযোগে কলকাতা খাই।
ভাঁড়ের চায়ের মতো অনুপম গন্ধযুক্ত কলকাতা, তাতে
যতই চুমুক দিই, শেষটুকু বাকি থেকে যায়—
ফুটপাথ আছে বলে প্রেমে ঝাড় খাওয়ার পরেও
খুনি হাওয়া বরাবর শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত
বাউন্ডুলে হেঁটে যাওয়া আছে।
এমন পেপার-লেস দিনে, পুনরায় প্রেমে পড়বার মতো,
বইয়ের নেশায় রক্ত নেচে ওঠা আছে—

ফুটপাথ আছে বলে আমি জেনে গেছি—
কোনও এক 'প্রতারক' এক 'মৌসুমী'র জন্মদিনে
উপহার দিয়েছিল লেভি স্ট্রাউসের লেখা 'মিথ ও মিনিং'।
স্বাক্ষরের জায়গাটা কালি উঠে গেছে, তবু অনুমান করি
সে কি শুধু প্রতারক? না কি সে-ই 'মৌসুমী'র প্রকৃত প্রেমিক?
আজও সেই প্রতারক অথবা প্রেমিক
নিশ্চয় জানে না, তার দেওয়া সেই 'দামি' উপহার
কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে আরও বহু কমদামি বইয়ের সঙ্গেই
গুরুত্ববিহীন ভাবে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা আছে।

ফুটপাথ আছে বলে সব প্রতারণা আজ ফাঁস হয়ে গেছে...

সন্দীপন চক্রবর্তী

কবিতা

স্মৃতির ভিতর তুমি বেঁচে থাকো রক্তপায়ী শিকড়ের মতো
অন্ধকার জল তুমি, ভেঙে যাও সহস্র ধারায়—
সটান বর্শার মতো বিঁধে যাও বুকে চোখে পেটে
ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো শিরদাঁড়া, তাও যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাও তুমি
প্রলয়ের মাঝে ভাস নোয়ার নৌকার মতো, ঘটনাবিহীন

স্তব্ধতার খনি থেকে গুলমোহরের চারা তুলে আনো তুমি
তুলে আনো কথাবীজ, সময়হীনের ফুল, আলো—
ধরা ও ছোঁয়ার থেকে সরে যাও কোয়ান্টাম লাফে।
আলোকবর্ষ দূরে খিলখিল হাসি তুলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে যাও
শূন্যের ভিতর থেকে খাই মারো বিষাদের মতো

মিথুনসঙ্গীকে তুমি অতর্কিত গিলে নাও সঙ্গমের শেষে।
তোমাকে চিনি না আমি, কিছুটা চিনিও, তুমি ক্যামোফ্লাজে এসে
আমার সর্বস্ব নিয়ে চলে গেছ, সর্বস্ব দিয়েছ

তুমি কি কবিতা শুধু? শুধুই কবিতা?

তুষারকান্তি রায়

বর্ষার প্রাক্‌কথা

উড়ো মেঘে এই যে খানিক বৃষ্টি হয়ে গেল,
এই যে রাখালের মাঠ থেকে
ডেকে উঠল হারানো বাছুর;
হাঁসেরা পুকুর ছেড়ে শব্দ করতে করতে চলে যাচ্ছে;
হাততালি দিচ্ছে ন্যাংটো বিভোর,
ভেজা ঘাস থেকে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা স্নিগ্ধ,
আমি তাকে অনুরাগ বলে ডাকি...

আমি হাঁটছি, আর
সোঁদা গন্ধে ভরে উঠছে পুরনো সম্পর্ক।

সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এ শহর আমাদের নয়

চৈত্রের খরশান দিনে কোথা থেকে উড়ে এল মেঘ
গোপন চুম্বন থেকে যে-পথ হয়ে গেছে মডুলার কিচেন
হলুদ পাতার সেই পথে আমি আজ ফিরে গিয়ে দেখলাম—
নয়ের দশকের বান্ধবী, দুঃখ লুটিয়ে দিচ্ছে আঁচলে...
পার্কে ভেসে থাকা কোনও ঝাপসা কাঠের বেঞ্চ
দূরে উড়ে যাওয়া, ডানা ঝাপটানো ধূসর মোটরবাইক—
ওরা আর আমাদের নয়
এ শহর আমাদের নয়, আমাদের নয় আর গঙ্গায় জ্যোৎস্না-চলাচল
মেগাপলিসের নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে যাওয়া সমস্ত চিঠি ও দলিল
কোথা থেকে মেঘে মেঘে উড়ে এল আজ
ফিরে এল ভাঙা মুখ, মৃত কথা, ব্যর্থ জ্যামিতি
রোবটের হন্নোড়ে আজ আমি গাছ হয়ে মিশে গিয়ে দেখলাম—
বাকলে লিখে রাখা অক্ষর... কেউ তার অর্থ জানে না।